Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির সম্পর্কান্বয় প্রসঙ্গ দ্বিভাষিকতার নিহিত প্রেক্ষিত অন্বেষণ

বিকাশ মুরমু

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/22_Bikash-Murmu.pdf

সারসংক্ষেপ: ইংরেজি 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দ 'সংস্কৃতি' ধরা হয়। আসলে সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব শিক্ষা এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে তাই সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই প্রতিটি মানুষ বা জনগোষ্ঠী তার নিজস্ব স্ব-সৃষ্ট সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কিন্তু দুই জনগোষ্ঠীকে একতায় বেঁধে রাখলে কালান্তরে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সূত্রে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে। তাই পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে বাঙালি ও সাঁওতালি সংস্কৃতির মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটেছে। বাঙালি ও সাঁওতাল এই দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ভাষায় দ্বিভাষিক হওয়ার প্রবণতাটি নিহিত রয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা দ্বিভাষিকতার নিহিত প্রেক্ষিত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কান্বয় প্রদর্শনে প্রয়াসী হবো।

সূচক শব্দ: সংস্কৃতি, ভাষিক সমন্বয়, দ্বিভাষিকতা, বাঙালির ইতিহাস, সাঁওতালি পুরাণ ও হিন্দু পুরাণ, সাঁওতাল ও বাঙালি, সংস্কার-বিশ্বাস

প্রথমেই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি 'কালচার'এর বাংলা সর্জন 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে দেখা যায়, — "The training and refinement of mind, tastes and manners the condition of thus being trained and refined. Culture is the intellectual side of civilization." বলা যেতে পারে যে, মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা বা চর্যাচর্যের স্বরূপই তার সংস্কৃতি। প্রতিটি মানুষ বা জনগোষ্ঠীই তার নিজস্ব জীবন চেতনানুযায়ী এক একটি স্ব-সৃষ্ট সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কিন্তু ভূগোল, ইতিহাসাদি যখন দুই জনগোষ্ঠীকে একতায় বেঁধে রাখে কালে কালান্তরে, তখন উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সূত্র নিহিত থেকে যায়, থেকে যায় ভাষিক সমন্বয়ের ক্ষেত্র। যেমনটা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে বাঙালি ও সাঁওতালি সংস্কৃতির মধ্যে সুলভ। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের জন্যই ভাষিক সমন্বয়ও ঘটেছে, কেননা ভাষাও সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। এই ভাষিক সমন্বয়ই দ্বিভাষিকতা সৃষ্টির প্রেক্ষিত, ফলে বাঙালি ও সাঁওতাল এই দুই ভাষিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ভাষায় দ্বিভাষিক হওয়ার প্রবণতাটি নিহিত রয়ে গেছে। প্রথমেই আসা যাক দ্বিভাষিকতা সম্পর্কে —

চার্লস ফার্গুসন ১৯৫৯ সালে 'Diglossia' বা 'দ্বিবাচনিকতা' প্রসঙ্গটি প্রথম নিয়ে আসছেন, এবং সে সূত্রেই 'Bilingualism'এর কথা আনছেন। দ্বিভাষিকতা বা 'bilingualism'এর বিষয় হলো একের অধিক ভাষার ব্যবহার। কোনো ব্যক্তি দুটো ভাষা জানতে পারলে, তাকে বলা হবে দ্বিভাষিক। আবার কোনো গোষ্ঠী বা জাতিও দ্বিভাষিক হতে পারে। একটি ব্যক্তি বা একটি জাতি (যেমন দক্ষিণবঙ্গের সাঁওতাল জনগোষ্ঠী) নানা কারণে দ্বিভাষিক হতে পারে। যখন ভৌগোলিক কারণে একই অঞ্চলে একটি ভাষী বা ভাষিক গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করে, তাহলে 'Language speaking pattern'এর মিশ্ররূপ তৈরি হওয়া উচিত। ভাষার 'Bio-Program'র তত্ত্ব ধরলে একথা মান্যতা পাওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আবার যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুটি ভাষিক গোষ্ঠীর একটি ভাষা dominant হয়, তবে ভিন্ন

subjugate ভাষাকে ওই ‘dominate’ বা ‘বড় ভাষা’র আধিপত্য মেনে নিয়ে সেই ভাষীদের দ্বিভাষিক হতেই হয়। যেমন দক্ষিণবঙ্গে বাংলা ভাষা সাঁওতালি ভাষাকে ‘dominate’ করে রেখেছে। কাজেই এখানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে বাংলা ভাষায় দ্বিভাষিক হতেই হয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলেই বাঙালিদের একাংশ যে সাঁওতালি ভাষায় দ্বিভাষিক, তাও দেখা যায়।

এই দুই ভাষাগোষ্ঠী যে পরস্পর পরস্পরের ভাষায় দ্বিভাষিক হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বাঙালি যে জাতিতে আর্য নয়, সে যে অনার্য, তা ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

“বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য জাতি — মোঙ্গোল কোল মোন্-খমের দ্রাবিড় এই সব মিলে সৃষ্ট খিচুড়ি।”[১]

আবার এই খিচুড়িতে যে গরম-মশলা পড়েছে, সেই গরম-মশলাটুকুতেও ভেজাল আছে বলে জানিয়েছেন সুনীতিকুমার। আর এই জাতির ভাষাটি, তাঁর মতে “অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য ভাষা।”[২]

ভাষাচার্য তাঁর O.D.B.L. এ বিকৃত প্রাচ্য সংস্কৃতি থেকেই যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি, তা দেখিয়েছেন। তাহলে এটি বোঝাই যাচ্ছে যে, অনার্যদের দ্বারাই কথ্যভাষা বাংলার সৃষ্টি হয়েছে, তাই বাংলা মিশ্র অনার্য ভাষা ও বাঙালি জাতিও মিশ্র অনার্য জাতি। এই অনার্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অস্ট্রিক বর্গে সাঁওতালি প্রভৃতি ভাষা আছে। কাজেই অনার্য সাঁওতাল ইত্যাদি গোষ্ঠীর অনার্যত্বের সঙ্গে বাঙালির অনার্যত্বের মিল ও পারস্পরিক গ্রহণ-বর্জনের জন্যই উভয় জাতির সাংস্কৃতিক নানান আদানপ্রদান বিষয়গুলি গড়ে উঠেছে। এখানে তার কতকগুলি দিক আলোচনা করা গেল —

প্রথমেই, ভৌগোলিক ইতিহাসের বিষয়ে আসা যাক। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব’ গ্রন্থে বাংলার যে ভৌগোলিক সীমা দেখিয়েছেন বর্তমানে তা পরিবর্তন হলেও আসলে এই সকল অঞ্চল সাঁওতাল ইত্যাদি অনার্যদেরই বসবাস, তা বলাবাহুল্য। কারণ বাংলার প্রাচীন জনপদগুলির যে নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, যথা — ‘বঙ্গাঃ’, ‘রাঢ়াঃ’, ‘পুণ্ড্রাঃ’ ইত্যাদি শব্দগুলি সাঁওতালি ভাষাজাত এবং এই শব্দগুলিই তাদের গোষ্ঠী বা কৌম জীবনের নিদর্শন। কাজেই যা বাংলার সীমানা, তা সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য গোষ্ঠীর বসবাসের ঠিকানা। তাহলে দীর্ঘদিন ধরে দুটি ভাষাগোষ্ঠী একই ভৌগোলিক পরিসীমায় একই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবন কাটাতে গিয়ে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক সমন্বয়, ভাষিক সমন্বয় ও তাদের পারস্পরিক ‘Language speaking pattern’এ মিশ্ররূপ — এগুলিই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে নিহিত দ্বিভাষিকতার প্রেক্ষিত।

সুতরাং একই ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডে একই ভূ-প্রকৃতিতে দুই ভাষিক গোষ্ঠী বাঙালি আর সাঁওতাল দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই উভয়ের বেশ কতকগুলো সাংস্কৃতিক বিষয়ে আন্তঃসম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছে। সেগুলি হলো —

ক. সৃষ্টিতত্ত্বের ভাবনা : মিথ অনুযায়ী

এক, সাঁওতালি পুরাণ ও হিন্দু পুরাণ উভয় পুরাণেই বলা হয়েছে, পৃথিবী প্রথমে জলমগ্ন ছিল; দুই, দুই জাতির পুরাণেই ডিম থেকে সৃষ্টির কথা আছে; তিন, জল থেকে মাটি তুলে স্থলভাগ সৃষ্টির কথা উভয় জাতের পুরাণেই আছে; চার, কোনো কোনো শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় অশ্বের কথা উল্লেখ আছে। উচ্চৈঃশ্রবা নামে স্বর্গের ঘোড়া দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন বলে কথিত। সাঁওতালি পুরাণেও সৃষ্টিতত্ত্বে ‘সিঞ্ সাদম’ নামে ঘোড়াকে উচ্চৈঃশ্রবার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়। তবে বাঙালি হিন্দুরা যে সৃষ্টিতত্ত্বে সাঁওতালি পুরাণ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় সৃষ্টিতত্ত্বে ‘ডিম’ বা ‘পক্ষী টোটেম’ ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। কারণ বাঙালির ধর্মীয় জীবনে যে বহু দেবদেবীর বাহন হিসাবে ওই পক্ষী ব্যবহৃত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই পক্ষীই যে সাঁওতালদের টোটেম তা তাদের পুরাণেই উল্লেখিত। নৃ-ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — “বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা দাক্ষিণদের নিকট হইতে-ই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বপ্রপঞ্চকে

অণ্ডবৎ ("ব্রহ্মাণ্ড"-রূপে) কল্পনা, এবং মৎস কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারের কল্পনা, মূলতঃ ইহাদেরই বলিয়া মনে হয়।"[৩]

বলাবাহুল্য, এখানে 'দাক্ষিণদের' বলতে সুনীতিবাবু সাঁওতাল প্রভৃতি কোল জাতিকেই বলেছেন। আর্য-ব্রাহ্মণ্য 'পালিশ' পড়ায় এই বিষয়গুলি ধরা না গেলেও সুনীতিবাবুর মতই সত্য।

খ. সামাজিক সংগঠনের মূল্যায়ন

সাঁওতাল জনসমাজকে বলা হয়ে থাকে মৌচাকের মতো গোষ্ঠীবদ্ধ। এই সমাজের গঠনটি ছিল দু'ধরণের, যথা —— রাজনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাস। রাজনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় —— গ্রাম শাসনের সর্বোচ্চপদে যিনি ছিলেন তাঁকে বলা হয় 'মাঝি'। ইনি হলেন 'Supreme'। এর মাধ্যমেই নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা হয়, সমাজের সমস্ত সামাজিক কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, সংস্কার যথা —— জন্ম, বিবাহ, বিচার ইত্যাদি মাঝির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া থাকে 'পারাণিক', 'জগমাঝি', 'শ্রেজগ-পারাণিক', 'নায়কে', 'কুডাম-নায়কে' ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাসটি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস-নির্ভর। সাঁওতালদের সমাজে সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে লক্ষ করা যেত —— 'কিস্কু' পদবীর লোকেরা রাপাজ' বা রাজা' নামে পরিচিত হতো তাদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য, 'হেমব্রম'রা সমাজের প্রধান (noble man) ও সামাজিক বিচারক রূপে পরিচিত হতো, 'মুর্মু'রা ঠাকুর বা পৌরোহিত্যের কাজ-কর্ম করে থাকত ইত্যাদি। আবার নানান বিধিনিষেধভিত্তিক গোত্র হিসেবে নানান 'Taboo'ও তারা মেনে চলে। সেই অনুযায়ী তাদের আলাদা ধর্মীয় প্রতীকও আছে।

বাঙালির সমাজ সংগঠনের দিকে তাকালে দেখা যায় কৌমভিত্তিক সংগঠন। এই কোমগুলি ছিল বঙ্গা, রাঢ়, পুণ্ড্র, গৌড় ইত্যাদি যাদের সম্পর্কে আমরা আগেই বলবার চেষ্টা করেছি। এই কোমগুলিই যেহেতু অনার্য বাঙালির পরিচয়, তাই বাঙালি সমাজ গঠনে অনার্য সাঁওতালদের যে প্রভাব ও দান আছে, তা ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জনবাবুর মতোই বহু পণ্ডিত মনে করেছেন। যেমন নীহারবাবু লিখেছেন ——

"আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতী শাসনযন্ত্র এই প্রাচীন কৌম সমাজের দান; পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত দলপতি স্থানীয় কৌম শাসনযন্ত্রে নায়কত্ব করিতেন। মাতৃপ্রধান বা পিতৃপ্রধান কৌম ব্যবস্থানুযায়ী উত্তরাধিকার শাসন নিয়ন্ত্রিত হইত, এবং সামাজিক দণ্ডের ও নির্দেশের কর্তা ছিলেন পঞ্চায়েতমণ্ডলী।"[৪]

এখন যেমন ব্রাহ্মণদেরও অনেক বিভাগ আছে ও অনেক গোত্র আছে, আর সেই গোত্রের 'Taboo'গুলো তারা সেইভাবেই মেনে চলে। অনুরূপ অন্যান্য বৃত্তিধারী মানুষদেরও, যারা সকলেই সংকর বর্ণ, তাই 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' যাদের 'উত্তম-সংকর, মধ্যম-সংকর ও অধম-সংকর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরও অনেক বিভাগ ও গোত্র এবং গোত্রের 'Taboo' আছে, তারাও এই 'Taboo' গুলো মেনে চলে। তাই বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সাঁওতালদের মতোই বাঙালিদেরও এই আন্তর্গঠনটি দেখা যায়। আবার সাঁওতালদের মতোই এই গোত্রগুলির যে আলাদা আলাদা চিহ্ন ছিল তা উল্লেখ করেছেন গবেষক পণ্ডিত লোকেশ্বর বসু:

"গোত্রের অর্থ গোষ্ঠ বা গো-সম্পদে যুক্ত বা স্থিত। প্রাথমিক পর্বে আর্যরা ছিল পশুপালক। সম্পদ বলতে বোঝাতো গোধন। আদিতে এই গোধন ও গো-চারণ-ভূমি ছিল যৌথসম্পদ। বোধহয় গরুগুলির গায়ে পৃথক পৃথক দগ্ধচিহ্ন দিয়ে গোষ্ঠীর মালিকানার সাক্ষ্য রাখা হত। কালক্রমে এগুলি পরিবার বা গোষ্ঠীর সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। যে ঋষির গো-সম্পদে গোষ্ঠী নির্ভরশীল ছিল সেই গোষ্ঠীর সকলেই সেই গোত্রনাম গ্রহণ করে।"[৫]

আবার হয়তোবা সাঁওতালদের মতোই বাঙালির বিভিন্ন গোত্রগুলির ধর্মীয় প্রতীক কিংবা পরিবারগত টোটেম থাকতে পারে।

গ. সামাজিক তথা লৌকিক আচার

একটি সমাজবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর পালিত সামাজিক আচারই তার জাতি সত্তার পরিচয় দেয়। আর এখানেই দক্ষিণবঙ্গের বাঙালি ও সাঁওতালদের পালিত সামাজিক আচারগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উভয় ভাষী

একটি জাতি সত্তারই বর্তমান প্রতিভূ। যেমন —

জন্মসংস্কার :

বাঙালি সমাজে যখন কোনো শিশু জন্মায় তখন একজন 'দাই বুড়ি'কে আনা হতো এবং সেই-ই মাতৃ-জঠর থেকে নাড়ি ছেদন করে শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে সাহায্য করত। একই বিষয় সাঁওতাল শিশুর জন্মের সময়ও করে থাকে 'দাই বুড়ি' যাকে সাঁওতালিতে 'দাঁই বুডহি' বলা হয়। মনে হয় এই শব্দ থেকেই আগত 'দাই বুড়ি' শব্দটি। এছাড়া নামকরণে উভয় সমাজেই শিশু তার পিতৃকুলের গুরুজনের নাম পায় এবং পরেরবারের সন্তানরা মাতৃকুলের নাম পেয়ে থাকে। ছয়মাস পর শিশুর অন্নপ্রাশনে বাঙালি সমাজে যে লোকাচারগুলি আছে তা সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্যদের কাছ থেকেই গৃহীত। এই অনুষ্ঠানকে সাঁওতালিতে বলা হয় 'চাচো ছাটিয়ার'।

বিবাহরীতি :

বিবাহরীতিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একই বিষয় লক্ষ করা যায়। তার দু'একটি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা গেল — বাঙালি সমাজে নিমন্ত্রণের সময় যে পান-সুপারির ব্যবহার করা হয়, সেই "পান ও সুপারীর ব্যবহার ইহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় সভ্যতায় গৃহীত হয়।"[৬] এখানে 'ইহাদের' বলতে নৃ-ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিবাবু সাঁওতাল প্রভৃতি কোল জাতিকেই বলেছেন। অর্থাৎ গাছের পাতা দিয়ে নিমন্ত্রণের সংস্কৃতি সাঁওতালদের থেকেই আগত। কারণ সাঁওতালি সমাজেও নিমন্ত্রণে শালগাছের পাতা ব্যবহার করা হয়, যাকে বলে 'গিরী'। অবশ্য এই পাতার সঙ্গে থাকে হলুদ জলে চোবানো গিঁটবাঁধা সাদা সুতো, দুর্বাঘাস ও আতপচাল। এই শালপাতা ব্যবহারের ধারণা থেকেই পত্র বা নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে।

বাঙালিদের বিবাহে হলুদের ব্যবহারও এদের কাছ থেকেই নেওয়া। বিবাহের আগের দিন বিবাহের মণ্ডপ সজ্জায় আমপাতা, কলাগাছ, তীর, মাঝখানে খোঁড়া গর্ত ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙালিরা সাঁওতালদের থেকেই গ্রহণ করেছে।

সাঁওতালদের ক্ষেত্রে পাত্র বিবাহে রওনা হয়ে প্রথমে একটি বৃক্ষকে বিবাহ করে, সেটি মূলত আম্রবৃক্ষই হয়। এটি একটি লোকাচার। মনে হয় এর উদ্দেশ্য হলো সাঁওতালদের প্রকৃতি সংরক্ষণ। প্রাচীনকালে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও এরূপ বৃক্ষ বিবাহ ছিল বলে গবেষক পণ্ডিত অতুল সুর মহাশয় জানিয়েছেন। অবশ্য সেখানে একাধিক বিবাহ সম্পর্কিত লোকাচারই প্রদর্শিত। আবার বিবাহের নানান রকমফের উভয় জাতির মধ্যেই লক্ষ করা যায়।

মৃত্যুসংস্কার :

মৃতদেহ কেন্দ্রিক যে সংস্কার, তা উভয় ভাষীদের ক্ষেত্রে একইভাবে পরিলক্ষিত। তারপর চিতা সাজানো, মৃতদেহটি দক্ষিণদিকে মাথা করে শোয়ানো, মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বারা মুখাগ্নি, ক্রমে আত্মীয়-পরিজনদের দ্বারা অগ্নিসংযোগ, মৃতদেহ দাহ হবার পর একটি মাটির ভাঁড়ে দগ্ধাস্থি সযত্নে সংগ্রহ — এ সবই বাঙালি হিন্দুরা সাঁওতালদের থেকেই নিয়েছে। E. T. Dalton লিখেছেন —

"The Brahman like the santal, carefully preserves the bones in an earthen vessel; he is ordered to bury them in a safe place till a convenient season arrives for his journey to the sacred river – in his case the Ganges – where he consigns the vessel with its contents to the river."[৭]

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত সিদ্ধ খাওয়া, শ্রাদ্ধের দিন পুরানো হাঁড়ি-কুড়ি, জামাকপড় ফেলা, পরিবারের লোকেদের চুল-দাড়ি-নখ কেটে অশৌচ মুক্ত হওয়া, তারপর নতুন ধুতি বা পোশাক ও গলায় বেলকাঠের কণ্ঠীমালা পড়া — এসবই যে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের কাছ থেকেই বাঙালিরা নিয়েছে তা, অনেকেই বলেছেন। এমনকি "মৃতের উপর স্তূপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ছিল।"[৮] এই 'দাক্ষিণ' বলতে ভাষাচার্য সুনীতিবাবু সাঁওতাল প্রভৃতি কোল জাতির কথাই বলেছেন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়

লিখেছেন —

"আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে বর্তমান।"[৯]

বাঙালির ও সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করলে এই উক্তির যাথার্থতা পাওয়া যাবে। এখানে কেবল গণনা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিকে দেখানো হলো —

ঘ. গণনা পদ্ধতি

প্রাচীন বাংলায় এমনকি দক্ষিণবঙ্গো একেবারে গ্রাম্য এলাকায় যেসমস্ত বাঙালি বসবাস করে তাদের সংখ্যা গণনা এরকম, যথা — এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়ি ইত্যাদি। আবার বাইশকে (২২) বলে এক কুড়ি দুই এইভাবে। আবার এক পণ অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য,

"এই কুড়ি শব্দটি এবং গণনারীতিটি — দুইই অস্ট্রিক। সাঁওতালি ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গো সঙ্গো ৪-ও। মূল অর্থ চার। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি অঙ্গুলির সঙ্গো সম্পৃক্ত; কুড়িই তাহাদের সংখ্যাগণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এক মান। কাজেই এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (৪X২০=৮০) এক পণ। এই অর্থে আশিও পণ, চারও পণ। এই পণও তাহা হইলে অস্ট্রিক শব্দ।"[১০]

৩০দিনে এক মাস, এই একমাস কিন্তু চান্দ্রমাস, অর্থাৎ চন্দ্রের তিথি ধরে ৩০দিন গণনা করা হয়। সাঁওতালিতে এক মাসকে 'চাঁদো' বলা হয় অর্থাৎ চান্দ্রমাসের ধারণা এইখান থেকেই। নৃ-ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন — "চন্দ্রের তিথি ধরিয়া কাল নিরূপণ-ও সম্ভবতঃ ইহাদেরই রীতি ছিল।"[১১]

কৃষি ও প্রকৃতি-কেন্দ্রিক যাপিত জীবন

ভারত তথা সমগ্র বাংলায় সাঁওতাল প্রভৃতি অস্ট্রিক গোষ্ঠীই যে প্রথম কৃষিকর্মের সূত্রপাত করেছিল তা, প্রায় সকল সমালোচকই বলেছেন। "বস্তুত, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্যপ্রবাহ মূলত ক্ষীণ।"[১২] এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমারও বলেছিলেন যে বাঙালির এই 'আর্য্যামী' আসলে 'গরম-মশলা' মাত্র। তাই কৃষি ও প্রকৃতি-কেন্দ্রিক বাঙালির যে সংস্কৃতি, তা যে সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে, কতকগুলি বিষয় আলোচনা করলে, তা প্রমাণিত হবে।

ক. সহরায় বা সরহায় ও কালীপুজো

কৃষিকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল ও বাঙালিদের নানান লোকাচার থাকে বীজ বপন থেকে শুরু করে শস্য সংগ্রহ পর্যন্ত। শস্য সংগ্রহ হয়ে গেলে সাঁওতালরা যে উৎসব পালন করে থাকে তাকে 'সরহায়' বা 'সহরায়' বলে। বড়ো অমাবস্যা বা জ্বালা অমাবস্যা বা দীপাবলি বা কালীপুজোর দিন থেকে পাঁচদিন ও পাঁচরাত্রি ধরে চলে এই উৎসব। অমাবস্যার পর দিনই পিত্রালয় থেকে দাদা, ভাই বা কেউ এসে প্রবাসী মেয়ে ও তার স্বামীকে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে যায় তার বাপের বাড়ি। এই দিনটি মেয়ের অহংকারের দিন। এই দিনটির জন্য মা মেয়ে সংবৎসরকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা করে থাকে। এই নিয়ে 'সরহায়'এর কত গান আছে। ভক্তকবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের আগমনী ও বিজয়ার যে সংগীতগুলি গড়ে উঠেছে, যে সমাজ-প্রেক্ষিত ও সুরকে কেন্দ্র করে, তার ভিত্তি সাঁওতালদের 'সরহায়' উৎসব বলেই মনে হয়। কারণ সাঁওতালদের মতো বাঙালি বিবাহিত কন্যারাও দুর্গাপুজোর আগে বৎসরান্তে একবার পিতৃগৃহে আসে এবং মা মেয়ের পরস্পর করুণ অপেক্ষার অবসান হয় এই সময়েই। এই বিষয়ই দেব-দেবীর আধারে পরিবেশিত করেছেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত।

খ. বাহা ও বসন্তোৎসব

প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণের পাতা ও ফুলরাশিকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সাঁওতালদের উৎসব হলো 'বাহা' অর্থাৎ ফুল। এই উৎসব হলো কৃতজ্ঞতারই অভিনন্দন, কারণ এই ফুল, ফলে রূপান্তরিত হবে আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি

নিয়ে, অর্থাৎ এ উৎসব হলো শস্যলাভের প্রত্যাশার উৎসব — অবগুণ্ঠিত কৃষি উৎসব। আবার এ উৎসব বৃক্ষ ও প্রকৃতি পূজাও, যা বাঙালির বৃক্ষপূজা বা প্রকৃতি পুজোর উৎস। বাহা পরবে সাঁওতাল নারীরা প্রথম পুজোর শাল ফুল মাথায় পড়ে ও নাচগান করে। একে 'বাহা এনেচ্' বা 'পুষ্প নৃত্য' বলা হয়। পুজোর দ্বিতীয় দিনে একে অপরকে জল কিংবা ধুলো দিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় সাঁওতাল নর-নারীরা অনেকটাই মুক্ত অবস্থায় থাকে। লক্ষণীয় এই 'বাহা' অনুষ্ঠানই বাঙালি সমাজে মনে হয় 'বসন্তোৎসব'এ পরিণত হয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে হোলী বা দোলযাত্রা।

গ. শারদোৎসব তথা দুর্গোৎসব ও দাঁশায়

দুর্গম বর্ষার পর যখন বাংলার গ্রাম ও প্রান্তর শ্যামল হয়ে ওঠে, তখন বিশ্রাম ও অবসরের দিনে কৃষিজীবী বাঙালি নবপত্রিকাকে আহ্বান জানাত, আর দীর্ঘকাল ধরে চলত এই উৎসব। এই নবপত্রিকা হলো কদলী, ডালিম, ধান, হলুদ, মান, কচু, বেল, অশোক ও জয়ন্তী। আসলে এটি এক প্রচ্ছন্ন কৃষি উৎসব, সাঁওতালদের 'বাহা' পরবের মধ্যে লক্ষণীয়, বসন্তকালীন নবরূপে প্রকৃতিকে পূজা আসলে কৃষির উৎসব। এই নবপত্রিকা পূজাই হলো শারদোৎসব, আর এই উৎসবে 'দুর্গা' যুক্ত হওয়ার ফলে এটি দুর্গোৎসব নামে পরিচিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে নবপত্রিকার পূজাই দুর্গোৎসবের উৎস। এই শরৎকালীন দেবী দুর্গার পূজা একমাত্র 'কৃত্তিবাসী রামায়ণেই' পাওয়া যায়, আর কোথাও নয়। তবে তিনি যে দুর্গা — এই নামটি পাওয়া যাচ্ছে সাঁওতালি লোককাহিনিতে। এই লোককাহিনিতে আছে, আর্য দলনেতা ইন্দ্রের সঙ্গে অনার্য তথা খেরোয়াল দলনেতা 'হুদুড়দুর্গা'র প্রচণ্ড লড়াইয়ে ইন্দ্র পরাজিত হওয়ার পর এক অসাধারণ সুন্দরী কুহকিনী যুবতী নারীকে পাঠানো হয়েছিল হুদুড়দুর্গাকে ছলাকলা দেখিয়ে বধ করতে। ওই নারীর কুহকিনী মায়ায় খুব সহজেই খেরোয়াল দলনেতা পরাজিত হয়। আর ওই দলনেতাকে বধ করায় সেই নারীর নাম হয় 'দুর্গা'। তাই সাঁওতাল ছেলেরা এই পুজোর কটাদিন বাড়িতে আলো জ্বালায় না বা অন্ধকার করে রাখে। আর বাড়িতে থাকে না কিংবা কাজেও যায় না, তারা মাথায় পাগড়ি বেঁধে ময়ূরের পালক গুঁজে নারীর মতো পোশাক পড়ে লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি 'ভুয়াং' বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি এই যুদ্ধে পরাজয়ের কাহিনি ও দুঃখ বর্ণনা করে বেড়ায় গানের মাধ্যমে। এটিই তাদের 'দাঁশায়' পরব বা 'দাঁশায় এনেচ্' (নৃত্য)।

উক্ত দুর্গাপুজোর অন্যান্য দেব-দেবীদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দেবী লক্ষ্মী হলেন ধানের বা সম্পদের দেবী। তাঁর বাহন হলো পেঁচা, অর্থাৎ তিনি কৃষির দেবী — এই ধারণা যে সাঁওতালদেরই, তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখাবার চেষ্টা করেছি।

অন্যদিকে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, গণেশের ইঁদুর, সরস্বতীর হাঁস, কার্তিকের ময়ূর, আবার মনসার সাপ, চণ্ডীর গোসাপ ইত্যাদি বাহনগুলি সাঁওতাল প্রভৃতি অস্ট্রিক গোষ্ঠীর পশু-পক্ষী 'টোটেম'এরই ধারণা-জাত। বলাবাহুল্য, শিব যে অনার্য, তা সর্বৈব সত্য। যদিও দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনা অনার্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির দান, তবে দ্রাবিড়ীয় 'লিঙ্গা-ধারণা' বা শিবমূর্তি নির্মাণ সাঁওতাল তথা খেরওয়াল গোষ্ঠীর পৌরাণিক দেবতা 'মারাংবুরু' থেকে বলেই মনে হয়।

নানান বিশ্বাস-সংস্কার

এবার বাঙালির নানান সংস্কার তথা 'ট্যাবু'কেন্দ্রিক মানসগঠনের বিষয়টি আলোচনা করা হলো। প্রথমে বাঙালির 'মঙ্গল ঘট'এর কথা ধরা যাক। বাঙালির সমস্ত শুভকাজে জলপূর্ণ কলস দরজার পাশে রাখা হয়। এই ঘট পূজাতে বা ঘটে যে জিনিসগুলি লাগে তা সবই সাঁওতাল বা কোল গোষ্ঠীর আদিম সংস্কার পদ্ধতিরই দান। এরকম মঙ্গল ঘটকে সাঁওতালিতে বলে 'সাগুন ঠিলি' বা 'পুণ্য কলস'। এই সংস্কার বা 'ট্যাবু'ই বাঙালির মঙ্গলঘটে অর্পিত। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে (বিবাহ, পুজো ইত্যাদি), গৃহপ্রবেশে, অতিথিবরণে কলা ও কলাগাছ, দুর্বাঘাস, ধান, আমপাতা বা আম্রপল্লব, হলুদ ইত্যাদির একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। এই সমস্ত গাছ বা শস্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস বাঙালিরা সাঁওতাল সমাজ থেকেই গ্রহণ করেছে।

বাঙালির নারী মহলে যেসকল সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তা হলো গ্রামসমাজে শিশুর জন্মের পর তার হাতে লোহার বালা পরানো, কোমরে লোহার জাল-কাঠি পরানো, শিশু ঘুমানোর সময় মাথার দিকে বিছানার কাজললতা কিংবা লোহার কিছু রাখা, চোখে কাজল ও কপালে টিপ পরানো ইত্যাদি সংস্কারের পিছনে যে অশুভ বিষয়ের বিশ্বাস তা সাঁওতালি সংস্কার থেকেই আত্মীকৃত। এমনকি আগেকার দিনে ছেলে-মেয়েদের একটা করে ডাক নাম রাখা — পচা, বুচি, পটল, টেপি, কেলো, গুলে, গুয়ে, হাবা, হাঁদা ইত্যাদির পিছনে ওই অশুভদৃষ্টির সংস্কারই কাজ করত।

এই যে উভয় ভাষাভাষীর একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করার ফলে যে সাংস্কৃতিক মিল বা acculturation ঘটেছে, ফলে উভয় জাতিগোষ্ঠীই তাদের যাপিত জীবনে একই জীবনাভিজ্ঞতাকে তাদের লোকসাহিত্যে ব্যক্ত করেছে, তা প্রবাদই হোক, বা ধাঁধাঁ, ছড়া, লোককথা, লোকগান কিংবা সাঁওতালি বিনতি ও বাঙালি ব্রতই হোক — সব ক্ষেত্রেই তাদের সাংস্কৃতিক মিল ও মিশ্রণটি লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক হলো ভাষা। ফলে ভাষার শব্দভাণ্ডারেও উভই ভাষীর আন্তঃসম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে একই অঞ্চলে বসবাস করার জন্য এবং দৈনন্দিন জীবন ধারণের ফলে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক থেকে। বাংলার বহু জিনিসের নাম, তার দেশি শব্দ বলে খ্যাত এমন অনেক শব্দ, বিশেষ করে বাঙালির ধ্বন্যাত্মক শব্দ যে সাঁওতালি শব্দ দ্বারা গঠিত, তা গবেষক ড. ক্ষুদিরাম দাশ মহাশয় তাঁর 'সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান' বইয়ে দেখিয়েছেন। এমনকি বাঙালির অনেক স্থাননামও যে সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য শব্দ দ্বারা গঠিত, তা ভাষাচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাংলা স্থাননাম' বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সাঁওতালি ভাষায় যে অনেক বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা আমরা অনেকেই জানি। এই কারণেই তাদের মধ্যে ভাষিক রীতির আন্তঃসম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা তাদের পরস্পরের ভাষায় দ্বিভাষিক হওয়ার পথকে ত্বরান্বিত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. 'বাংলা ভাষার কুলজী', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরি এম, এ, বার-য়াট-ল কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, উইকলী নোটস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, পৃ. ১
২. ওই, পৃ. ৪
৩. 'সাংস্কৃতিকী' (অখণ্ড সংস্করণ), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ ২০১৭, পৃ. ৫৪ (অতঃপর 'সাংস্কৃতিকী' নামে উল্লিখিত)
৪. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব', নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬, পৃ. ৩১৮ (অতঃপর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব' নামে উল্লিখিত)
৫. 'আমাদের পদবীর ইতিহাস', লোকেশ্বর বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৪০
৬. 'সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ)', পৃ. ৫২
৭. 'Descriptive Ethnology of Bengal,' Dalton Edward Tuite, Printed for the Government of Bengal under the Direction of the Council of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1872, p. 229
৮. 'সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ)', পৃ. ৫৪
৯. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব', পৃ. ৪৪২
১০. ওই, পৃ. ৪৩
১১. 'বাংলা ভাষার কুলজী', পৃ. ৪
১২. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব', পৃ. ৪৩

লেখক পরিচিতি: বিকাশ মুরমু, সহকারি অধ্যাপক, আরামবাগ গার্লস কলেজ, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ